কাজের মাঝে রবের খোঁজে

সমকালীন প্রকাশন

সূচিপত্র

বিন্দু থেকে সিন্ধু	১১
অমরত্বের গল্প	১৫
ডাকি কল্যাণের পথে	১৮
বরকতময় বিনিয়োগ	২২
ভ্রমণের ফাঁকে	২৪
শখগুলো সব অন্যরকম	২৭
সুসন্তান	৩০
প্রকৃত সম্পদ	৩২
জীবনীশক্তি	৩৪
একটুখানি চেষ্টা	৩৬
প্রস্তুতি	৩৮
নিআমতের কদর	৪৩
ওপারের সঞ্চয়	৪৬
যাত্রার মধ্যস্থলে	৪৮
দুআর জননী	৫২
সবর	৫৪

সুবর্ণ সুযোগ	৫৭
উম্ম দাওয়াত	৫৯
স্বর্ণে গড়া উপহার	৬১
তাওহিদের ভিত	৬৪
ছোট ছোট চেষ্টাগুলো	৬৭
স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি	৬৯
মনোবলের জয়	৭১
নয়নজুড়ানো উপহার	৭৫
পরের তরে	৭৭
শূন্য মরুভূমি	৭৯
পবিত্র বন্ধন	৮১

বিন্দু থেকে সিন্ধু

এক.

মিলিকে আজ বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। স্কুল থেকে বাসায় ফিরতে ফিরতে ফাতিমা বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করে ফেলেছে, 'মা তোমার কী হয়েছে?'

মিলির কোনো খেয়াল নেই তাতে। মাঝে মাঝে সাড়া দিতে হুঁ-হাঁ করছে। মাথার ভেতর পরিকল্পনার ঝড়—কীভাবে শুরু করা যায়? আচ্ছা, আগে বাসায় যাওয়া যাক।

দুপুরের রান্না ও সকালেই সেরে ফেলেছে। মিলির সব কাজ রুটিনমাফিক চলে। এখন বাসায় ফিরে ফাতিমাকে গোসল করাবে। তারপর সালাত আর মা-মেয়ের খাওয়া-দাওয়া। দুপুরের খাওয়া শেষে ফাতিমার ঘুমানো বাধ্যতামূলক।

এই সময়টাতে মিলিও চেষ্টা করে ঘুমানোর। কেন যেন ঘুম আসে না। ফাতিমা হবার পর ঘুম জিনিসটা বড় আরাধ্য ছিল। আর এখন ফাতিমা বড় হয়েছে, স্কুলে যাচ্ছে। ঘুমানোর যথেষ্ট সময়, অথচ চোখে ঘুম নেই। মিলি অবশ্য এতে একদমই হতাশ নয়। এই সময়টাতে এমন কিছু কাজ করা যায়, যা করার কথা বিগত ছয় বছরে সে ভাবতেও পারেনি। আজকের অলস দুপুরেও মিলি বসে থাকবে না। মাথার ভেতর জট পাকানো আধাআধি পরিকল্পনাকে পূর্ণতা দেবে।

দুই.

মিলির ছটফটানিতেই কি না কে জানে ফাতিমা একটু দেরি করে ঘুমাল। অস্থির মিলি যথাসম্ভব পা টিপে টিপে চলে গেল বিছানা থেকে নিরাপদ দূরত্বে। পড়ার টেবিলে স্কুলের খাতাগুলো একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা। ফাতিমা নিজেই খুব সুন্দর করে টেবিল গুছিয়ে রাখে। মিলি শুধু একবার দেখিয়ে দিয়েছিল।

ফাতিমার একেকটা খাতা উল্টেপাল্টে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিলি। ক্লাস ওয়ানের শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে আর বেশিদিন বাকি নেই। অথচ খাতার অর্ধেকটাই ফাঁকা রয়ে গেছে। ক্লাস টুতে উঠে গেলে এই খাতার আর কোনো কাজ নেই। কাগজের কী নিদারুণ অপচয়!

একে একে সবগুলো খাতা খুলে দেখে সে। সবগুলোর একই দশা। এই খাতাগুলোর সদ্ব্যবহার কি আদৌ সম্ভব?

ফাতিমার বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হতে বাকি আর ১০ দিন। এর মধ্যেই একবার প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করে এলে কেমন হয়? ভাবতে ভাবতে স্মার্টফোনটা হাতে নেয় মিলি। ওয়াইফাই অন করে দ্রুতগতিতে ব্রাউজ করে DIY notebook binding.

ব্যস! খাতা বানানোর অজস্র টিউটোরিয়াল একদম চোখের সামনে। এবার পুরোনো খাতা থেকে কাগজ নিয়ে চলছে নতুন খাতা বানাবার প্রজেক্ট।

তিন.

এই মুহূর্তে মিলি আর খাদিজা একটি মহিলা মাদ্রাসার মুহতামিমার সামনে বসা। খাদিজার মেয়েও ফাতিমার সাথে একই স্কুলে পড়ে। এই দুই অভিভাবক মিলে মোটামুটি একটা অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে।

সেদিন পুরোনো খাতা থেকে নতুন খাতা বানিয়ে মিলি ফোন দেয় খাদিজাকে। মিলির উদ্দেশ্য ছিল আরও কয়েকজন অভিভাবককে জানানো। তাহলে তারাও নতুন খাতা তৈরি করে অভাবী কাউকে দান করে দিতে পারবে।

মিলির প্রস্তাবে খাদিজা রাজি হয়। তবে বলেছিল আরও বড় পরিসরে ভাবতে। যার ফলাফল পরদিন বাচ্চাদের স্কুলে হাজির হওয়া। স্কুলের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করে তারা। প্রিন্সিপাল বেশ আগ্রহের সাথে এই প্রজেক্টটিকে স্বাগত জানান। তখনই

পিয়ন পাঠিয়ে ক্লাসে ক্লাসে নোটিশ দেন ছাত্রীরা যেন বার্ষিক পরীক্ষার শেষ দিন নিজেদের খাতাগুলো নিয়ে আসে।

শত শত ছাত্রী নিজেদের খাতার অতিরিক্ত পেইজগুলো জমা দেয় মিলি আর খাদিজার কাছে। উদ্যোগটা সম্পর্কে জানতে পেরে অনেকে পেন্সিল, ইরেজার, কলম নিয়েও হাজির। প্রিন্সিপালও নিজে থেকে কিছু অনুদান দেন আনুষঙ্গিক খরচ জোগাতে।

এরপর টানা দুই সপ্তাহ তারা ব্যস্ত ছিল খাতা বানানোর কাজে। দুজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১২০ পৃষ্ঠার মোট ২০০টা খাতা তৈরি হয়ে যায়। সেই খাতার বান্ডিল নিয়ে মিলি আর খাদিজা হাজির হয়েছে কাছেপিঠের এক মাদ্রাসায়। এখানে ইয়াতিম মেয়েরা পড়াশোনা করে।

মাদ্রাসার মুহতামিমা খাতাগুলো খুশিমনে গ্রহণ করেছেন। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে কথা বলেছেন খাদিজা আর মিলির সাথে।

'আপনারা কিন্তু একসাথে দুইটা কাজ করলেন!' হাসিমুখে বললেন মুহতামিমা। 'অপচয় রোধে এগিয়ে এলেন, অভাবী শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার পথও দেখালেন। এতে কী হবে জানেন?'

খাদিজা আর মিলি চুপচাপ শুনে যাচ্ছে। মুহতামিমা আবার বলতে শুরু করলেন, 'আপনাদের দেখানো পথ ধরে যারাই এ আমল করবে, তার সমপরিমাণ সাওয়াব আপনাদের ঝুলিতে জমা হবে। অথচ তাদের সাওয়াব এতটুকু কমবে না। কী চমৎকার ব্যাপার না!'

জবাবে মিলি আর খাদিজা দুজনেই মুচকি হাসল। সত্যিই এক অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করছে তাদের মনে।

'আপনারা পড়েছেন কি না জানি না, আমি একটা বইতে ঠিক এ রকম প্রকল্পের কথাই পড়েছিলাম। সৌদি আরবের দাম্মাম এলাকায় এভাবে পুরোনো খাতা থেকে চার হাজার পাঁচশোটি খাতা বানানো হয়েছিল।'

'চার হাজার পাঁচশো!' মিলি অবাক।

'জি, দাম্মাম এলাকার সব ছাত্রছাত্রী এগিয়ে এসেছিল। মলাটের ব্যবস্থা করেছিল দাম্মামের এক দাতা সংস্থা। ছাত্রছাত্রীরা কাগজ দিয়ে সহায়তা তো করেছিলই, সেইসাথে নিজেরাও বসে গিয়েছিল খাতা বানানোর কাজে...'

একমনে বলেই যাচ্ছেন মুহতামিমা। তার মুখটা ঝাপসা হয়ে এসেছে মিলির সামনে। কোনো কথাই আর শুনতে পাচ্ছে না সে। কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে গেছে মিলি, আরও বড় পরিসরে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে।

অমরত্বের গল্প

অধ্যক্ষার চোখে পানি। হলরুমে পিনপতন নীরবতা। শত শত ছাত্রী বসে আছে, কারও মুখে কোনো কথা নেই। উন্মুখ হয়ে সবাই অধ্যক্ষার বক্তব্য শুনছে।

আসরের আযান হয়ে যাবে, হাতে সময় নেই। দ্রুত চোখ মুছে অধ্যক্ষা ফিরে গেলেন স্মৃতিচারণে, 'সুমাইয়া বিনতু আহমাদকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি। সময় নেই, অথচ মন চাইছে সবটা তোমাদের বলি। তোমরা জেনে নাও কাকে হারিয়েছ। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য যেন এক উপহার ছিল।'

একটু থেমে ছাত্রীদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। প্রিয় ছাত্রী সম্পর্কে বলবার আগে সবার পূর্ণ মনোযোগ চাইছেন যেন।

'একদিন সুমাইয়া এলো আমার রুমে। সালাম দিয়ে আমার কাছে কিছু সময় চেয়ে নিল। মেয়েটা কেন এসেছিল, জানো? আমাকে পর্দার ব্যাপারে নাসিহা দিতে। মূল কথায় যাবার আগে সে এত সুন্দর করে আমার কল্যাণ কামনা করল, যা আমি আজও ভুলতে পারি না। খুব দরদ নিয়ে বলছিল মেয়েটা, মিস আপনি কী সুন্দর হিজাব পরেন! আল্লাহ আপনার এই ইবাদত কবুল করে নিক। আপনি যদি মোজা পরে পা দুটোও ঢেকে রাখতেন, তাহলে কতই না ভালো হতো! হিজাবে পূর্ণতা আসত, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাও খুশি হতেন।

আমি জানতাম ও যা বলছে, সত্যই বলছে। সত্য কথা সবসময় মনে একটা সুন্দর প্রভাব ফেলে। আমি পরদিনই মোজা পরতে শুরু করলাম। সুমাইয়া সেদিন এও

বলেছিল, মিস আপনি যখন থাকবেন না, তখনো আপনার কথা, আপনার কাজ আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে, ইন শা আল্লাহ।

কী অদ্ভুত! আমিই থেকে গেলাম। সুমাইয়া চলে গেল আমাদের ছেড়ে।'

অধ্যক্ষা সুমাইয়ার কথা বলেই চলেছেন কান্নাচাপা গলায়। মাত্র ১৫ বছরের একটা মেয়ে। কী উচ্ছলতা, কী প্রাণচাঞ্চল্য! মেয়েটা সেদিনও এসেছিল তার সাথে কথা বলতে। স্কুলের আয়াদের জন্য কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চায় সে। সব আয়োজন শেষের পথে ছিল, আর দুদিন পরই একজন আলিমার তত্ত্বাবধানে কুরআনের ক্লাস শুরু হবে। সব ঠিকঠাক, কেবল সুমাইয়া নেই। সড়ক-দুর্ঘটনা তার প্রাণ কেড়ে নিল।

তার বক্তব্য শেষে সুমাইয়ার সহপাঠীদের মধ্য থেকে বক্তব্য প্রদানের আহ্বান করা হলো। নীরব হলরুমে গুঞ্জন। সবারই কিছু না কিছু বলার আছে, সুমাইয়া যে সবার বন্ধু ছিল! কিন্তু ডায়াস পর্যন্ত কেউ আসছে না।

হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে স্টেজে এলো সোনিয়া। এক লাফে গুঞ্জনের আওয়াজ বেড়ে গেল কয়েক ডেসিবেল। শোক ছাপিয়ে সহপাঠীদের চোখে মুখে আতঙ্ক কী বলবে সোনিয়া? সোনিয়া তো সেই মেয়ে, যে কিনা সুমাইয়ার সমস্ত আমল, ভালো উদ্যোগ নিয়ে অবজ্ঞা করত। মেতে উঠত হাসি-তামাশায়।

ধীরপায়ে ডায়াসে এসে দাঁড়িয়েছে সোনিয়া। গতকালও মেয়েটা দুই বেণি দুলিয়ে কলেজে এসেছিল। আজ পরনে হিজাব। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে বক্তব্য শুরু করল রাসুলের ওপর দরূদ পাঠ করে। সহপাঠীরা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'আমি জানি, সুমাইয়ার ব্যাপারে আমি কিছু বলব এমনটা কেউ আশা করেনি। তবু কী মনে হলো জানেন? মনে হলো সহপাঠীদের মধ্যে যদি কারও কিছু বলার থাকে, তবে সেটা আমিই।'

স্তব্ধ শ্রোতাদের আরও স্তব্ধ করে দিয়ে সোনিয়া বলতে লাগল সুমাইয়ার কথা।

ওকে কখনো আমি স্বস্তিতে থাকতে দিইনি। মেয়েটা বাসে সবসময় হেডফোনে কুরআন তিলাওয়াত শুনত, অর্থ পড়ত; মুখস্থ করার চেষ্টা করত।

আমি বলতাম, অ্যাই সুমাইয়া, বাসের ভেতর আঁতলামি করছিস কেন? বাসায় গিয়ে আঁতলামি করিস।

ও একটুও বিরক্ত হতো না। বলত, আসা যাওয়ায় সময়টা গল্প করে কাটিয়ে দিচ্ছি আমরা। এটা কি ঠিক বল? এই সময়টাতে বেশি না, চার-পাঁচটা আয়াত মুখস্থ করলেও কয়েক মাসের মধ্যে একটা বড় সুরা মুখস্থ হয়ে যায়!

আমি মুখ বাঁকাতাম। বলতাম, তোর সব লোক-দেখানো আমল। ও হাসত। জবাব দিত না। অনেকেই সুমাইয়ার দেখাদেখি টাকা জমিয়ে ইসলামি বই কিনত, অবসরে আলিমদের লেকচার শুনত। আমাকে ও অনেক বোঝাত। বলত, দেখ সোনিয়া, আমাদের হাতে সময় নেই। যেকোনো মুহূর্তে আমরা চলে যেতে পারি। হঠাৎ যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিই, রবের সামনে কী নিয়ে দাঁড়াব?''

সত্যিই উদাসীন ছিলাম আমি। শত নাসিহাতেও বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করিনি। ওর আকস্মিক মৃত্যু আমার ভেতরটা ওলটপালট করে দিল। আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না...ওর কথা আমার এখনো কানে বাজছে—'হঠাৎ যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিই?'

জানেন, সুমাইয়া একবার বলেছিল ও শহিদি মৃত্যু চায়। আমি আকুল হয়ে চাই, আল্লাহ যেন ওকে শহিদ হিসেবে কবুল করে নেন, ওকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সোনিয়া। হৃদয় থেকে উৎসারিত কান্না ছুঁয়ে যায় সবাইকে। সবার চোখে অশ্রু। সবাই আজ রবের দরবারে সেই মেয়েটির জন্য জান্নাত চাইছে—যার কথা কাজ সবই ছিল দাওয়াতের উজ্জ্বল নিদর্শন।

ডাকি কল্যাণের পথে

অবশেষে বিছানায় পড়েই গেলাম! যেনতেন বেডে নয়, একদম সোজা হাসপাতালের বেডে!

একটা স্কুলে বিজ্ঞান পড়াই আমি। গেল সপ্তাহে স্কুলের বিজ্ঞানমেলা ছিল। আমার চেষ্টা থাকে ছাত্রীরা যতটুকুই শিখুক, তাতে যেন স্রষ্টার মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারে। মেলায় খাটতে হয়েছে প্রচুর। তখন টের পাইনি শরীরের কী বেহাল দশা। টের পেলাম বিজ্ঞানমেলা শেষে। দুই-তিনটা টেস্টের পর ডেঙ্গু ধরা পড়ল। অবস্থা যা ছিল তাতে বাড়িতেও দিব্যি চিকিৎসা চলত। তবু বাড়িতে থাকলে বিশ্রাম নেব না জেনেই বুঝি আমাকে হসপিটালে ভর্তি করিয়ে দিল সবাই।

ওদিকে আমার মন পড়ে আছে স্কুলে। বেশিদিন হয়নি স্কুলে জয়েন করেছি। ইসলামি স্কুল, বেশ আগ্রহ নিয়ে সিভি জমা দিয়েছিলাম। উম্মাহর জন্য কিছু করার ইচ্ছা থেকেই এই পেশায় আসা। তখনই নিয়ত করেছিলাম বেতনের পুরো টাকাটা সাদাকা করে দেবো।

জয়েনের পর কিছুটা হতাশ হতে হলো। স্কুলটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। দাওয়াতি কাজে কোনো অগ্রগতি নেই। আগে হালাকার আয়োজন হতো, এখন তাও হচ্ছে না।

ক্রমাগত সাহায্য চাচ্ছিলাম আল্লাহর কাছে। প্রথমে শিক্ষকদের দাওয়াত দেবার নিয়ত করলাম। শিক্ষকরা যখন দ্বীনচর্চার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে, শিক্ষার্থীদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। টিচার্সরুমে ইসলামি বই নেড়েচেড়ে দেখতাম।

একদিন এক সিনিয়র শিক্ষিকা পাশে এসে বসলেন। বেশ আগ্রহভরে জানতে চাইলেন কী পড়ছি। সুযোগ হাতছাড়া করলাম না, সারমর্ম বললাম। এমনভাবে বলার চেষ্টা করলাম যাতে বইটা পড়তে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। স্কুল থেকে ফেরার পথে বইটি উপহার দিয়েছিলাম তাকে।

এভাবে সুযোগ পেলেই সব শিক্ষিকার হাতে ইসলামি বই ধরিয়ে দিতাম। কখনো-বা কোনো লেকচারের অডিও লিংক।

এর কিছুদিন পর সেই সিনিয়র শিক্ষিকা খুব আফসোস করলেন। বিগত পাঁচটা বছর হেলায় হারিয়েছেন। দ্বীন নিয়ে একটুও ভাবেননি। দুনিয়ার মোহে মজে ছিলেন।

তার বোধোদয় হতে দেখে কী যে শান্তি লেগেছিল বলে বোঝাতে পারব না! আমরা শিক্ষিকারা নতুন উদ্যমে ছাত্রীদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় পরিবর্তনটা ছিল চোখে পড়ার মতো।

দাওয়াতি কাজ চলছিল প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনায়। এমন আনন্দের মুহূর্তেই ডেঙ্গু ধরা পড়ল। বন্দি হলাম হাসপাতালের বেডে। আল্লাহর নির্ধারণ, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন—এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। তবু কি মন মানে! একটা দুঃখবোধ রয়েই যাচ্ছিল। স্কুলে থাকতে পারলে দ্বীনের দাওয়াতে আমিও শরিক হতে পারতাম।

অবশ্য এ নিয়ে হতাশায় তলিয়ে যাওয়ার মানে নেই কোনো। ইসলামি লেকচার, কুরআন তিলাওয়াত শোনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম আগের মতোই।

একদিনের কথা। হালকা ভলিউমে কুরআন তিলাওয়াত চলছে। পাশের বেডের বৃদ্ধা হঠাৎ ডাকলেন আমাকে। ফিরে তাকাতেই বললেন, 'আওয়াজটা একটু বাড়িয়ে দাও না, আমিও শুনি!'

খুশি হলাম খুব। ভলিউম বাড়িয়ে দুজন মিলে তিলাওয়াত শুনতে লাগলাম। এরপর তার সাথে অনেক আলাপ হয়েছে আমার। ভদ্রমহিলার ইসলামি জ্ঞান তেমন একটা ছিল না। সুযোগ পেয়ে যতটা সম্ভব তাকে জানানোর চেষ্টা করলাম।

আরেকদিনের কথা। সুন্নাহসম্মত যিকির আর দুআর একটা বই পড়ছিলাম। সে সময় ডিউটিরত ডাক্তার দেখতে চাইলেন বইটা। ইসলামি বই নিয়ে আলোচনা হলো বেশ। তার ইচ্ছা হাসপাতালের করিডোরে একটা বুকশেল্ফের ব্যবস্থা করবেন। সেখানে যাবতীয় ইসলামি বই থাকবে, বিশেষ করে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় দাওয়াতি বই।

জন্ম-মৃত্যু চোখের সামনে দেখার স্থান এই হাসপাতাল। কেউ আসছে রোগী হয়ে, কেউ যাচ্ছে লাশ হয়ে, কেউ-বা আবার নবজাতককে বুকে জড়িয়ে ঘরে ফিরছে। এ সময়টায় মানুষের মন নরম থাকে, সত্য জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে।

দ্বীন প্রচারের সুবর্ণ এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না এই ডাক্তার ভদ্রমহিলা। রোগীদের সবসময় ধৈর্য ধরার উপদেশ দেন। ফরয ইবাদতের তাগাদা দেন, নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার বীজ বুনে যান।

আমাকে আর বৃদ্ধাকে দেখে চলে যাচ্ছিলেন তিনি। দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কী মনে করে ফিরে এলেন। ইতস্ততভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'রোগীর সুস্থতা কামনা করে কোনো সুন্নাহসম্মত দুআ নেই?'

মনটা আনন্দে ভরে গেল। যিকির ও দুআর বইটা খুলে তাকে দুআ বের করে দিলাম। স্মার্টফোন বের করে দুআর ছবি তুলে নিলেন তিনি। আমাকে আর পাশের বৃদ্ধাকেও দুআ পড়ে দিলেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধার এক ভাগ্নি এলো তাকে দেখতে। খালার জন্য ফুল কিনে এনেছে সে। তা-ই দেখে বৃদ্ধা ধমকে উঠলেন, 'এই ফুল আনার কালচার কোথা থেকে আমদানি করেছিস? এমনিতেই ফুলের যা দাম! কী দরকার ছিল এসবের?'

'আহা খালা! তুমি টিভিতে দেখোনি, বাইরের দেশে রোগী দেখতে গেলে ফুল নিয়ে যায়?'

'কিন্তু আপু, কাফিরদের অন্ধ-অনুসরণ করতে তো আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।' তাদের আলোচনার মাঝে অনাহূত অতিথির মতো আমি বলে উঠলাম, 'রোগী দেখতে যাওয়ার কত সুন্দর সব রীতিনীতি আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে গেছেন!'

বৃদ্ধার ভাগ্নি মনে হয় খানিকটা বিব্রত হলো। তাকে বিব্রত করবার ইচ্ছা অবশ্য ছিল না আমার। হুট করে তাদের আলোচনায় ঢুকে যাওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলাম। বৃদ্ধাও কোমলসুরে ভাগ্নিকে বোঝালেন অনেক কিছু। আমাকে বললেন ভাগ্নিকে যেন রোগী দেখতে আসার দুআ শিখিয়ে দিই।

আল্লাহর পরিকল্পনা কত অদ্ভুত! ভেবেছিলাম এই বুঝি দাওয়াতি কাজে ভাটা পড়ল। অথচ পরম করুণাময় বিছানাবন্দি এই আমাকেও দ্বীনের দাওয়াত দেবার সুযোগ করে দিলেন।

বরকতময় বিনিয়োগ

মসজিদ থেকে আসরের আযান ভেসে আসছে। হাতের বইটা রেখে সালাতের প্রস্তুতি নিল ফারিহা। মাগরিবের পরই ড্রাইভার সিরাজ ভাই আসবেন। তার কাছে বইগুলো দিতে হবে কুরিয়ারের জন্য। আজকে মোট ২০টা পার্সেল দেশের বিভিন্ন ঠিকানায় কুরিয়ার করার ইচ্ছা।

সালাম ফেরাতেই সালমা হাজির। সালমা ফারিহাদের নতুন প্রতিবেশী। প্রাণোচ্ছল একটা মেয়ে। ফারিহার সাথে বই প্যাকিংয়ে বসে গেছে। সেইসাথে টুকটাক গল্প চলছে।

'কবে থেকে এই প্রজেক্ট চালু করলেন আপু?' আগ্রহভরে জানতে চাইল সালমা। এই প্রজেক্টের আদ্যোপান্ত জানার বড় শখ তার।

'সে তো প্রায় চার বছর হতে চলল। তুমি কি ফাতিমাকে চেনো? সেকেন্ড ফ্লোরে থাকে।'

'জি আপু, চিনি।' দড়ি দিয়ে শক্ত করে তিনটা বই বাঁধছে সালমা। একটা ইসলামি আকিদার বই, আর দুইটা মুসলিম নারীদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক বই।

'আমি আর ফাতিমা একদিন গল্প করছিলাম। এ-কথা সে-কথা থেকে অপচয়ের প্রসঙ্গ উঠল। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমরা দুজনেও কম অপচয় করি না। বিশেষ করে হাত খরচের টাকাটা প্রায়ই খেয়াল খুশিতে ব্যয় করে ফেলি। হয়তো একটা ক্র্যাফট ম্যাটেরিয়াল পছন্দ হয়ে গেল, হুট করে কিনে ফেললাম। ওয়ারড্রোবে জামার অভাব নেই, তবু চোখের খায়েশে একটা জামা কিনে ফেললাম। এমনই অবিবেচকের

মতো খরচ করতাম আমরা। সে রাতে দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম হুটহাট শখ পূরণে লাগাম টানব। উম্মাহর অভাবীদের কথা ভেবে হলেও অপচয় কমিয়ে দেবো।'

একনাগাড়ে কথা বলে একটু দম নিল ফারিহা।

'তারপর? শুরুটা কী করে হলো?'

'তারপর প্রতিমাসে অল্প অল্প করে টাকা জমানো শুরু। একটা মজার বিষয় কী, জানো? প্রথম প্রথম খরচ কমিয়ে টাকা জমানো অসম্ভব মনে হতো। কিন্তু মাস শেষে দেখতাম একটু হিসেব করে চললেই টাকা জমানো সম্ভব।

প্রথম দুই মাস আমাদের জমানো টাকা একটা দাতাসংস্থায় দিয়েছিলাম। ততদিনে আমাদের এই উদ্যোগের কথা অনেকেই জেনে গেছে। ক্লাসমেট, আত্মীয়স্বজন যারাই শুনেছে, সবাই বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তৃতীয় মাসে আমাদের কাছে মোটামুটি ভালো অঙ্কের টাকা জমা পড়ে। সেই টাকা দিয়ে আকিদা-সহ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর লেখা কিছু বই কিনতে শুরু করি আমরা। তখন থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় বইগুলো পাঠাচ্ছি। এখন তো প্রতিমাসে দুইশো থেকে আড়াইশোটা পার্সেল যাচ্ছে, আল-হামদু লিল্লাহ।'

'মা শা আল্লাহ, কী চমৎকার আইডিয়া আপু! অপচয় রোধ করতে গিয়ে কত সুন্দর একটা প্রজেক্টের অংশ হয়ে গেলেন!' সালমার বিস্ময় কাটছে না।

'আল-হামদু লিল্লাহ।' মৃদু হাসল ফারিহা। 'আসলে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন বলেই এতটা পথ পাড়ি দিতে পেরেছি আমরা। প্রতি বছরই এই উদ্যোগকে একটু একটু করে বাড়ানোর চেষ্টা করছি। তারপরও বই কেনার পর বছরশেষে কিছু টাকা থেকে যায়। সেই টাকাগুলো আমরা বিশ্বাসযোগ্য কিছু দাতাসংস্থাকে দিয়ে দিই। শীতের সময় দরিদ্রদের কম্বল দেওয়া, শরণার্থীদের জন্য টিউবওয়েল বসানো—এ রকম আরও কিছু প্রজেক্টে আমাদের দেওয়া অর্থ কাজে লেগেছে।'

সালমা তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছিল ফারিহার কথা। ঘোর ভাঙল মাগরিবের আযানে। সালাত শেষে ফারিহার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল সে। রিকশাভাড়া থেকে বাঁচানো টাকা। কে না চায় এমন বরকতময় কাজের অংশীদার হতে!

ভ্রমণের ফাঁকে

এক.

বিষণ্ন মনে ব্যাগ গোছাচ্ছে নিতু। এই মাসে টানা তিনদিন ছুটি পড়েছে। সেই উপলক্ষ্যে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা মিলে ঘুরতে যাচ্ছে একটা রিসোর্টে।

রাশেদ খুশিতে একরকম লাফাতে লাফাতেই নিতুকে বলেছিল ঘুরতে যাবার কথা। কিন্তু নিতুর মন সায় দেয় না। কেন যেন সব দেখা-সাক্ষাতের উপলক্ষ্যগুলো শেষমেশ গীবতের আসরে পরিণত হয়। তাই কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সংবাদ ওকে উদ্বেলিত করে না, বরং শঙ্কিত করে তোলে।

'তুমি শুধু ঘুরতে যাবার খারাপ দিকটাই দেখলে?' ওর অনীহা দেখে আহত স্বরে বলেছিল রাশেদ। 'আত্মীয়দের দ্বীনের দাওয়াত দেবার কী অভাবনীয় সুযোগ পাচ্ছ, সেটা ভেবে দেখলে না? আমরা কি চাই তারা সারা জীবন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে থাকুক?'

এরপর আর কোনো কথা চলে না। নিতু ব্যাগ গোছাতে শুরু করেছে। রাশেদের কথায় যুক্তি আছে। তবু মনটা খচখচ করে। এত বড় দায়িত্ব পালন করতে পারবে তো?

সবকিছুর আগে মন শান্ত করা জরুরি। তাই ব্যাগ গোছানো বাদ দিয়ে নিতু ফোন দিল যাইনাব আপুকে। দাওয়াতি কাজে তার জুড়ি মেলা ভার।

আপুর কথায় কী এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতা কাজ করে, মন শান্ত হতে বাধ্য। নিতুর কাছে সবটা শুনে তিনিও রাশেদের কথায় সুর মেলালেন। বললেন, 'নিতু এমন সুযোগ আর পাবে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হবে, দ্বীনের দাওয়াতও দিতে পারবে। কেন দ্বিধায় ভুগছ?'

'আপু, আপনি তো সবই জানেন! আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদের ইসলামি জ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায়। অধিকাংশ মহিলাই পর্দা করে না। এই অবস্থায় আমি কীভাবে কী করব?'

যাইনাব মৃদু হাসল, 'দেখো নিতু, আল্লাহ তাঁর পথে ডাকার দায়িত্ব দিয়ে আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এই দায়িত্ব পালনের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হেলায় হারাতে চাচ্ছ? তোমার চেষ্টা তুমি করবে, কবুল করার মালিক আল্লাহ।'

'কিন্তু আপু...'

'কোনো কিন্তু না। আল্লাহর কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না? তুমি কি তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছ এ ব্যাপারে?

নিতু, এমন তো হতেই পারে, তোমার আত্মীয়দের দ্বীনের আলোয় আলোকিত করতে আল্লাহ তোমাকেই মনোনীত করেছেন। পারে না? তুমি কি এ সুযোগ গ্রহণ করবে না? তাঁর কাছে সাহায্য চাও, এই দায়িত্ব কাঁধে নেবার শক্তি চাও।'

যাইনাবের কথা নিতুর জন্য টনিকের মতো কাজ করে। সে প্রবল উচ্ছ্বাসে ব্যাগ গুছিয়ে ফেলেছে। কিছু কেনাকাটা করতে হবে আত্মীয়দের জন্য। ছোটখাটো একটা লিস্ট বানিয়ে অনলাইনে অর্ডার করে দিল। 'অনলাইন শপিং' বরাবরই আল্লাহর দেওয়া নিআমত মনে হয় নিতুর কাছে।

দুই.

রিসোর্টটা খুব সুন্দর আর ছিমছাম। ভীষণ ভালো লেগেছে নিতুর। রাশেদ ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে আশেপাশের জায়গাটুকু। যা দেখা যাচ্ছে, তার সবটাই সুন্দর। অনন্তকাল এখানে ঘুরে বেড়ালেও বিরক্ত লাগবে না—এমন একটা পরিবেশ। এত কিছুর মাঝেও নিতু তার দায়িত্বের কথা ভোলেনি। বাসে উঠেই পরিবারের নারী সদস্যদের ইসলামি বই উপহার দিয়েছে, সঙ্গে হিজাব আর নিকাব। আর ছোট বাচ্চাদের চকলেট।

লাঞ্চের সময় একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিল অবশ্য। মাহরাম, গায়রে মাহরাম মিলেমিশে একেকটা টেবিলে বসে পড়েছে। নিতু বসার জায়গা পাচ্ছে না। শেষমেশ তার শাশুড়িকে বলতেই কয়েকজন মুরুব্বি মহিলা জড়ো করে ফেললেন তিনি। নিতুকে সঙ্গ দিতে তারা সবাই মিলে একটা কোণার টেবিলে বসল। অনেকদিন হলো সে নিকাবের আড়ালে খাওয়া-দাওয়া রপ্ত করে ফেলেছে। হিজাব পালনে ওর চেষ্টা দেখে এক মুরুব্বি বলেই বসলেন, 'আমাদেরও এমন করেই পর্দা করবার কথা ছিল।'

নিতু উৎসাহ দিল তাকে। বলল, 'আল্লাহ সবসময় তাঁর বান্দার জন্য ফিরে আসার দরজা খুলে রেখেছেন। আপনি চেষ্টা করলে এখনো সুন্দরভাবে পর্দা করতে পারবেন, ইন শা আল্লাহ।'

বিকেলে নিতুর পক্ষ থেকে ছোট বাচ্চাদের জন্য দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। সব বাচ্চা ওকে ভালোবেসে ফেলেছে। কাছে বসিয়ে সাহাবিদের গল্প শুনিয়েছে নিতু। কুরআন থেকেও শিখিয়েছে কিছু চমৎকার বিষয়। একসময় দেখা গেল বাচ্চাদের মায়েরা, তরুণীরাও হাজির নিতুর আসরে।

সবচেয়ে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল রাতের খাবারের সময়। নারী-পুরুষ একসাথে বসতে নিতুর অস্বীকৃতি সবার চোখে পড়েছিল। আর তাই রাতে নারীরা একপাশের টেবিলে বসল, পুরুষরা ভিন্ন টেবিলে। ফ্রি মিক্সিংয়ের কোনো অবকাশই রইল না আর। নিতু ভাবতেও পারেনি সামান্য একটা কাজের ফলাফল এত দ্রুত পেয়ে যাবে।

তরুণীদের সাথেও নিতুর সখ্যতা গড়ে উঠতে সময় লাগেনি। ফিরে যাবার দিন সে অবাক হয়ে দেখল, যে মেয়েটা পর্দার মৌলিক বিষয়গুলো জানত না, সেই মেয়েটাও ওর দেওয়া হিজাব পরে বাইরে বেরিয়েছে।

অশ্রুতে চোখ ঝাপসা নিতুর। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে কী না হয়! বারবার মনে পড়ছে যাইনাব আপুর কথা—

> **এমন তো হতেই পারে, তোমার আত্মীয়দের দ্বীনের আলোয় আলোকিত করতে আল্লাহ তোমাকেই মনোনীত করেছেন। তুমি কি এ সুযোগ গ্রহণ করবে না?**

শখগুলো সব অন্যরকম

সুমাইয়া, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিশারিজে স্নাতক। ঘরে বসে কীভাবে নিজের জ্ঞান কাজে লাগানো যায় ভাবতে ভাবতেই মাছ চাষ শুরু করেছিল সে। বাড়ির ছাদে শুরু হলো পরীক্ষামূলকভাবে কই আর পাবদার চাষ।

তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমার শখ কী?' সে অকপটে উত্তর দেয়, 'মাছ চাষ।' সবাই একটু অবাক হতো প্রথম প্রথম। অবাক হবার দিন শেষ। এখন অনেকেই ওর কাছ থেকে মাছ কেনে।

মাছ বিক্রির টাকাটা সুমাইয়া ব্যয় করে সাদাকায়। দান করে দেয় গরীব দুঃখীদের মাঝে।

☆☆☆

রাঁধতে ভালোবাসে আনিকা। দেশি কিংবা বিদেশি যেকোনো রান্নায় তার সীমাহীন আগ্রহ। সেদিন মালয়েশিয়া থেকে চাচাতো বোনের ফোন। একদিকে বোনের সাথে কথোপকথন, অন্যদিকে তেলেজলে পাঁচফোড়নের সংঘাত। আওয়াজ পৌঁছে গেল সুদূর মালয়েশিয়া পর্যন্ত।

বোন খানিকটা ভর্ৎসনাই করল। কেন এতটা সময় রান্নার পেছনে ব্যয় করছে আনিকা? এই সময়টা কি উম্মাহর স্বার্থে ব্যয় করা যেত না! আনিকা জবাব দেয় না। মৃদু হেসে প্রসঙ্গ পালটে ফেলে।

শখের রাঁধুনি আনিকা রান্না করা খাবার নিয়ে যায় প্রতিবেশীর বাড়িতে। এক হাতে খাবারের বাটি, আরেক হাতে সুন্দর একটা ঈমান জাগানিয়া বই। পাশের বাড়ির সন্তানসম্ভবা মেয়েটা জানে একবেলা রান্নার ঝক্কি থেকে বেঁচে যাওয়া কতটা সুখের। আনিকা তাকে সেই সুখটাই দিতে চায়।

☆☆☆

সদ্য কলেজে ওঠা ছেলেমেয়েরা বড্ড তাড়াহুড়ার মাঝে থাকে। ধৈর্য নিয়ে, সময় নিয়ে কিছু করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সায়মা এর ব্যতিক্রম। ১৭ বছরের সায়মা দাদির কাছে সুন্দর কুশিকাটার কাজ শিখেছে। ছোট্ট তুলতুলে জুতা থেকে শুরু করে মাথার টুপি, সোয়েটার, ম্যাট্রেস কত কিছুই-না বানায় সে!

আল্লাহর ইচ্ছায় সেসব বিক্রিও হয়ে যায় খুব দ্রুত। বিক্রির টাকাটা সায়মা বিধবা খাদেমাকে দেয়। তার ছেলের পড়ালেখার খরচ।

☆☆☆

সাফিয়া শখের বশে আচার বানায়। রাস্তার ধূলোবালি আর রং মেশানো আচারের থেকে ওর আচার কম সুস্বাদু নয়, বরং স্বাস্থ্যকর।

একদিন এক বোন ওকে চমৎকার পরামর্শ দিল। সাফিয়া চাইলেই এই শখকে দ্বীনের কাজে লাগাতে পারে। আচার খেতে কে না ভালোবাসে! কেবল অস্বাস্থ্যকর বলেই কিনে খায় না। সাফিয়া যদি ঘরে বানানো আচার বিক্রি করে, তবে কেনার মানুষের অভাব হবে না। আর বিক্রির অর্থ কোথাও সাদাকা করে দিতে পারলে সাওয়াবের খাতাও ভারী বৈ হালকা হবে না!

☆☆☆

তড়িঘড়ি করে সেলাই করা কাপড়গুলো ভাঁজ করছে সুরাইয়া। আজ মেয়ের স্কুলে হালাকা[১] আছে। গত এক মাস ধরে বেশ কয়েকটি সালাতের পোশাক, ছোট বাচ্চাদের জামা বানিয়েছে সে। হালাকার দিন অভিভাবকরা আসে। সুরাইয়ার কাছ

[১] দ্বীনের উদ্দেশ্যে কোনো তালিম, আলোচনা, অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য সমবেত হওয়াকে হালাকা বলে। সহজ কথায়, হালাকা একটি দ্বীনি মজলিস।

থেকে পছন্দ করে জামা কিনে নিয়ে যায়। বিক্রির টাকা দিয়ে সে ইসলামি বই কিনে বিতরণ করে অভাবীদের মাঝে।

☆☆☆

আফিয়া তার ফুপুর বাড়িতে এসেছে। ছোট ফুপাতো বোনের জন্য এনেছে কমলা আর শসা। বাগান করতে খুব ভালোবাসে সে। বারোমাসি ফল আর সবজির গাছ লাগিয়েছে। নিজের গাছের সবজি, ফল প্রতিবেশী আর আত্মীয়দের মাঝে বিলিয়ে দেওয়াতেই ওর সুখ।

☆☆☆

শারমিন বই পড়তে ভালোবাসে। গল্প উপন্যাসে বুঁদ হয়ে থাকা শারমিন যখন দ্বীনের পথে আসে, তখন নিজের পছন্দকে একটু বদলে নিল। এখন তার সময় কাটে ইসলামি বই পড়ে। প্রতিটা বই পড়া শেষে একটা সারসংক্ষেপ তৈরি করে সে। কখনো কোনো হালাকায় গেলে সেই সারসংক্ষেপের ফটোকপি বিতরণ করে বোনদের মাঝে। যাদের বড় বই পড়বার অভ্যাস নেই, তারা শারমিনের লেখা সারসংক্ষেপ পড়ে উপকৃত হয়। অনেকের মাঝে আবার সেই বইগুলো পড়বার আগ্রহও জন্মায়।

শখগুলো স্রেফ সময় কাটানোর মাধ্যম নয়। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার উপলক্ষ্য নয়। আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগবাদিতাকে উস্কে না দিয়েও শখ মেটানো সম্ভব। মুসলিম বোনদের শখগুলো হোক দ্বীনের পথের পাথেয়।